দ্যা ক্যান্সার ইন্ডাস্ট্রি

মূল

মার্ক স্লোন

অনুবাদ

আজনিন আক্তার ইভা

ফাউন্টেন

পা ব লি কে শ ন্স

সূচিপত্র

এই বইটা আপনি কেন পড়বেন **১৫**
ভূমিকা **১৮**
প্রারম্ভিকা **২৫**
- কারণ সময় খুব কাছে..... ২৭

১ম অধ্যায়
সার্জারি

- সার্জারি..... ২৯
- ক্যান্সার সার্জারির ইতিহাস..... ৩০
- চারটি ভয়ঙ্কর ক্যান্সার সার্জারি..... ৩১
- দ্য কমান্ডো..... ৩১
- দ্য হুইপল ৩২
- টোটাল এক্সেন্টেরেশন..... ৩২
- দ্য হেমিকর্পোরেক্টমি ৩৩
- ডক্টর ইয়ান হ্যারিসের একটি বার্তা..... ৩৪
- লক্ষ লক্ষ অপ্রয়োজনীয় অপারেশন..... ৩৫
- করোনারি আর্টারি বাইপাস সার্জারি..... ৩৬
- একটু কাছ থেকে দেখা যাক..... ৩৬
- সার্জারি বনাম ক্যান্সার..... ৩৮

- ক্যান্সার সার্জারি মেটাস্ট্যাসিস (ছড়িয়ে পড়া) বাড়ায়..... ৩৯
- সার্জারির স্ট্রেস..... ৪১
- টিউমারের মাইক্রো-এনভায়রনমেন্ট ৪৪
- ১৬টি উপায়ে সার্জারি ক্যান্সারের কারণ হয় ৪৫
- ক্যান্সার সার্জারি বিষয়ে কালজয়ী কিছু উক্তি ৪৯

২য় অধ্যায়
কেমোথেরাপি

- কেমোথেরাপি ৬৪
- যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ক্যান্সার ক্লিনিকে..... ৬৫
- মাস্টারজেনের জন্য সতর্কতামূলক লেবেল ৬৬
- কেমোথেরাপি বনাম ক্যান্সার ৬৬
- সাফল্যের গল্প? ৬৯
- কেমোথেরাপিতে একজন ক্যান্সার রোগীর অভিজ্ঞতা..... ৬৯
- কেমোথেরাপির পর স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য সংগ্রামরত নারীরা ... ৬৯
- কেমোথেরাপি ছাড়া কয়েক দশক পর্যন্ত বেঁচে থাকা ক্যান্সার রোগী ৭০
- অতিরিক্ত স্বাস্থ্যগত প্রভাব..... ৭০
- কালজয়ী উক্তি..... ৭৭

৩য় অধ্যায়
রেডিওথেরাপি

- রেডিওথেরাপি ৮৯
- এক্স-রে আবিষ্কার..... ৮৯

- জুতা ফিটিং করার জন্য এক্স-রে ফ্লুরোস্কোপ.....৯০
- বিনোদন হিসেবে ফ্লুরোস্কোপ..... ৯১
- রেডিওথেরাপি বনাম ক্যান্সার..... ৯১
- রেডিওথেরাপিতে মারাত্মক ডোজের ৫ গুণ বেশি প্রয়োগ করা হয় ৯২
- রেডিওথেরাপি এবং স্তন ক্যান্সার..... ৯২
- রেডিওথেরাপি এবং ফুসফুসের ক্যান্সার ৯৪
- হুইসেলব্লোয়ার কর্তৃক ক্যান্সারের মৃত্যুর পরিসংখ্যান ফাঁস ৯৫
- রেডিওথেরাপি আজীবন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়.....৯৬
- রেডিয়েশন বাইস্ট্যান্ডার এফেক্ট ৯৭
- একটু কাছ থেকে দেখা যাক.....৯৮
- সাফল্যের গল্প? ১০০
- রেডিওথেরাপি 'নিরাময়ের' পরে দীর্ঘস্থায়ী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ১০০
- রেডিয়েশন ওভারডোজের কারণে মৃত্যু..... ১০১
- অতিরিক্ত স্বাস্থ্যগত প্রভাব..... ১০১
- কালজয়ী উক্তি..... ১০৭

৪র্থ অধ্যায়
আগেভাগে রোগ নির্ণয় কি জীবন বাঁচায়?

- আগেভাগে রোগ নির্ণয় কি জীবন বাঁচায়?..... ১২৬
- পিএসএ টেস্ট - প্রোস্টেট ক্যান্সার স্ক্রিনিং.....১২৭
- একটু কাছ থেকে দেখা যাক... .....১২৯
- অতিরিক্ত রোগ নির্ণয় এবং অতিরিক্ত চিকিৎসা.....১৩০
- অনেক বড় মূল্য দিতে হয় ১৩১
- ম্যামোগ্রাফি - স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিং.....১৩৩
- একটু কাছ থেকে দেখা যাক... .....১৩৩

- অতিরিক্ত রোগ নির্ণয় এবং অতিরিক্ত চিকিৎসা..... ১৩৪
- অনেক বড় মূল্য দিতে হয়..... ১৩৫
- কম-ডোজ আয়নাইজিং রেডিয়েশনের বিপদ ১৩৫
- একটু কাছ থেকে দেখা যাক... ..... ১৩৫
- কম ডোজ উচ্চ ডোজের চেয়েও ক্ষতিকর ১৩৬
- একটু কাছ থেকে দেখা যাক... ..... ১৩৭
- কম মাত্রার আয়নাইজিং কীভাবে বড় মাত্রার রেডিয়েশনের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর?.....১৩৮
- এক্স-রের উপকার কি এর ঝুঁকির চেয়ে বেশি? ১৩৯
- ক্যান্সার স্ক্রিনিং: একটি জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়.....১৪১
- একটু কাছ থেকে দেখা যাক... .....১৪১
- কালজয়ী উক্তি..... ১৪৩

৫ম অধ্যায়
সত্যের জন্য লড়াই

- সত্যের জন্য লড়াই ১৫১
- ধনীদের মনস্তত্ত্ব ১৫২
- ক্যান্সার ইন্ডাস্ট্রির কারসাজির ঝুলি.....১৫২
- ক্যান্সারের নিরাময় কি চেপে রাখা হয়েছে?..... ১৫৩
- জালিয়াতিপূর্ণ ক্যান্সার গবেষণা? ১৫৪
- সত্যের লড়াই..... ১৫৮
- অনেক ক্যান্সার আসলে ক্ষতিকরই নয়..... ১৬০
- প্রোস্টেট ক্যান্সার.....১৬১
- স্তন ক্যান্সার..... ১৬২
- অন্যান্য বিবিধ ক্যান্সার..... ১৬৩
- ক্যান্সারের স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেরে যাওয়া ১৬৪

- একটু কাছ থেকে দেখা যাক... ১৬৫
- ক্যান্সার ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বড় গোপন সত্য ১৬৭
- একটু কাছ থেকে দেখা যাক... ১৬৭
- যারা চিকিৎসা নেননি, তারা বেশি দিন বেঁচেছেন ১৬৮
- কালজয়ী উক্তি ১৬৯

উপসংহার **১৭১**
- ক্যান্সার শিল্পের পতন ১৭২
- পৃথিবীকে সারিয়ে তোলা এবং ক্যান্সারের অবসান ১৭২

এই বইটা আপনি কেন পড়বেন

বারবার এমনটা হয়েছে। আমাদের প্রিয়জনদের কারো ক্যান্সার ধরা পড়েছে। সার্জারি, কেমোথেরাপি আর রেডিওথেরাপি চলেছে। তারপর মানুষটা মারা গেছে।

আমার মায়ের সাথেও এমনটা হয়েছিল। তখন আমার বয়স ছিল ১২। আমি এই বইটা লিখেছি, যাতে আমার মতো কষ্ট আর কোনো শিশুকে কখনো পেতে না হয়।

আমরা কেন ধরে নিই যে, ক্যান্সারই মানুষকে মারছে? ক্যান্সার ইন্ডাস্ট্রির ব্যবহার করা ছুরি-কাঁচি, বিষাক্ত ইনজেকশন বা মারাত্মক রেডিয়েশন নয়? ক্যান্সার কি আসলেই আমাদের জন্য হুমকি, নাকি মুনাফালোভী ক্যান্সার ইন্ডাস্ট্রিই আমাদের মেরে ফেলছে?

সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, বেঁচে থাকা মানুষদের মধ্যে ৫০ শতাংশের জীবনের কোনো না কোনো সময়ে ক্যান্সার ধরা পড়বে। আমার মনে হয়, আমাদের ক্যান্সার ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ে খোলামেলা এবং সৎভাবে খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই আমাদের পথ বদলাতে হবে।

আপনি এখন ক্যান্সার ইন্ডাস্ট্রির উপর করা সবচেয়ে বড় এবং সহজবোধ্য সায়েন্টিফিক গবেষণা পড়তে যাচ্ছেন। এখানে এক হাজারেরও বেশি সায়েন্টিফিক এবং ক্লিনিক্যাল স্টাডির তথ্য রয়েছে, যা এমনভাবে সহজ করে লেখা হয়েছে যে, একটা বাচ্চাও বুঝতে পারবে।

আপনি জানতে পারবেন :

- সার্জারি, কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপি আসলেই জীবন বাঁচায় কি না।
- দুটি কমন ক্যান্সার স্ক্রিনিং টেস্টের কারণে কী ভয়াবহ পরিমাণে ভুল ডায়াগনোসিস আর অতিরিক্ত ট্রিটমেন্ট করা হয়।
- ক্যান্সার ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে পরিসংখ্যানের কারসাজি করে মূলধারার চিকিৎসার কারণে হওয়া মৃত্যুর সংখ্যা আড়াল করে রাখে।
- ডাক্তারের ভুল, ক্ষতিকর চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ডাক্তারদের দ্বারা সৃষ্ট আঘাত বা মৃত্যু থেকে নিজেকে কীভাবে বাঁচাবেন।
- আপনার জীবনে যেন কখনো ক্যান্সার ধরা না পড়ে, তার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী যে কাজটি আপনি করতে পারেন।

দুঃখ থেকে আশার আলো

যখন আমার বয়স ১২, তখন আমার মা ক্যান্সারে মারা যান। তার জরায়ুর মুখে আঙুলের নখের মতো ছোট্ট একটা ক্ষত দেখতে পেয়ে ডাক্তাররা তাকে প্রচলিত ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য দ্রুত নিয়ে যান। এর তাৎক্ষণিক প্রভাবে তার স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতি হয়। এই ধরনের চিকিৎসার শিকার হওয়া অনেক মানুষের মতো আমার মা-ও ভয়াবহ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার শিকার হয়েছিলেন। এর ফলে তিনি প্রচণ্ড ব্যথায় ভুগতেন। হাঁটতে, কথা বলতে, এমনি কোনো শক্ত খাবারও খেতে পারতেন না।

আমার মনে আছে, গভীর রাতে আমি বিছানায় শুয়ে থাকতাম আর নিচের বসার ঘর থেকে তার কান্নার শব্দ শুনতাম। তিনি নীরবে কাঁদার চেষ্টা করতেন, যাতে আমি আর আমার বোন শান্তিতে ঘুমাতে পারি। আমার মনে হয় তিনি তখন জানতেন না, আমি সবই শুনতে পেতাম। তার প্রতিটি ফোঁপানি। প্রতিটি আর্তনাদ। আর সৃষ্টিকর্তার কাছে তার কষ্ট শেষ করার জন্য করা প্রতিটি আকুতিও।

কেন এমন হচ্ছিল?

আমি ভেবেছিলাম, আমাদের দেশের সেরা ডাক্তাররা তাকে সারিয়ে তোলার জন্য সেরা চিকিৎসা দিচ্ছেন। কিন্তু ডাক্তাররা যা কিছুই করছিলেন, তাতে সবকিছু আরও খারাপ হচ্ছিল। আমার খুব রাগ হচ্ছিল। আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

কয়েক মাস পর, বাবা আমাকে আর আমার বোনকে বসার ঘরের সোফায় বসালেন এবং গাল বেয়ে পড়া কান্না নিয়ে আমাদের জানালেন, আমাদের মা আর নেই।

মুক্তি

সেই আঘাত আজও আমার মনে আছে। মায়ের মৃত্যুর ১৫ বছর পর আমি এমন একটা বিষয় উপলব্ধি করি, যা আমার জীবনকে পুরোপুরি বদলে দেয়। আমি বুঝতে পারলাম, তার মৃত্যুটা কোনো দুর্ঘটনা ছিল না, এটা ছিল একটা সুযোগ। তিনি আমাকে এমন একটা গল্প বলার সুযোগ দিয়েছিলেন, যা মানুষের মনকে নাড়া দিতে পারে। আর এমন একটা মন দিয়েছিলেন, যা দিয়ে সেই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা সম্ভব, যেগুলো জানার জন্য সারা পৃথিবী মুখিয়ে আছে। আমি বুঝলাম, আমার মা মারা গিয়েছিলেন, যাতে আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য তৈরি হয়।

এই উপহারের বিনিময়ে আমি মনে মনে তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আমি ক্যান্সারের কারণ এবং প্রতিকার খুঁজে বের করব, যাতে আমার এবং আমার বোনের মতো কষ্ট আর কোনো শিশুকে কখনো পেতে না হয়। আমি জানতাম, যখন আমি উত্তরগুলো খুঁজে বের করে সবার সাথে শেয়ার করতে পারব, তখন আমার মায়ের পরিচয় আর ক্যান্সারের শিকার হিসেবে থাকবে না। তিনি এমন একজন বীরে পরিণত হবেন, যিনি তার ছেলেকে মানুষের জীবন বাঁচাতে এবং পৃথিবী বদলে দিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

এটা আমার প্রথম বই।

ভূমিকা

'আমার মনে হয় তিনি তখন জানতেন না, কিন্তু আমি তার প্রতিটি ফোঁপানি, প্রতিটি আর্তনাদ আর সৃষ্টিকর্তার কাছে তার কষ্ট শেষ করার জন্য করা প্রতিটি আকুতি শুনতে পেতাম'।

১৯৮৫ সালের বসন্তে, মা দিবসের দিন আমার এই পৃথিবীতে আসা। আর সেই আসাটা ছিল বেশ নাটকীয়। আমার মায়ের নাভিরজ্জু ফাঁস হয়ে আমার গলায় পেঁচিয়ে গিয়েছিল। খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই আমাকে সেই ফাঁস থেকে মুক্ত করার জন্য নার্স এবং ডাক্তাররা ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছিলেন। আমি শুধু কল্পনা করতে পারি, ডাক্তারকে যখন আমাকে মায়ের পেট থেকে টেনে বের করতে আর আমার গলা থেকে দড়িটার গিঁট খোলার জন্য তাড়াহুড়ো করতে দেখছিলেন, তখন আমার বাবা-মায়ের কেমন লাগছিল। সৌভাগ্যবশত, ডাক্তারদের চেষ্টা সফল হয়েছিল এবং আমার বাবা-মা একটি নতুন পুত্রসন্তান পেয়েছিলেন।

কানাডার অন্টারিওতে আমার বাবা-মা এবং বোনের সাথে বেড়ে ওঠাটা আর দশটা সাধারণ দুই সন্তানের পরিবারের মতোই ছিল। তবে কিছু কিছু দিক থেকে আমরা অন্যদের থেকে আলাদা ছিলাম। আমাদের একটা বিশেষত্ব ছিল যে, আমার বাবা নিজের ব্যবসা চালাতেন, যা তিনি একদম শূন্য থেকে শুরু করেছিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, তার আর আমার মায়ের প্রথম সন্তান আসছে। তিনি জানতেন, তখনকার চাকরি দিয়ে তিনি পরিবারকে যে জীবনটা দিতে চান, তা সম্ভব না। তাই তিনি সব ধরণের ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং কাজটা করে দেখিয়েছিলেন। বাবা যখন দিনরাত একটা সফল ব্যবসা দাঁড় করানোর জন্য খাটতেন, তখন মা বাসায় রান্নাবান্না, পয়-পরিষ্কার করা এবং আমার আর আমার বোনের যত্ন নেওয়ার কাজ করতেন।

আমার একদল দারুণ বন্ধু ছিল। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, কীভাবে আমরা রাস্তায় হকি খেলতাম। খেলা শেষ হলে আমরা ছোটাছুটি করতাম, সাঁতার কাটতাম, আগুন জ্বালাতাম। আর বেশিরভাগ দিনই আমাকে আমার তিন চাকার 'বিগ হুইলি' বাইক চালাতে দেখা যেত। শীতকালে, আমাদের রাস্তার মাথায় জমে থাকা বরফের পাহাড়ে আমরা সুড়ঙ্গ বানাতাম। একে অপরের দিকে বরফের গোলা ছুঁড়তাম। সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে স্কুলে যাওয়া আর না বুঝে শুধু তোতাপাখির মতো মুখস্থ করা— এই অস্বস্তিকর বাস্তবতাটুকু ছাড়া বাকি সব বেশ ভালোই চলছিল। কিন্তু আমরা সবাই একটা সময়ে গিয়ে শিখি যে, জীবনটা কত ঠুনকো, আর এক মুহূর্তেই সবকিছু কীভাবে বদলে যেতে পারে।

গ্রেড সেভেনে পড়ার সময় এক শীতের সকালে, বাবা আমাকে আর আমার বোনকে বসার ঘরের সোফায় বসালেন। বললেন, তার কিছু বলার আছে। আমি আশা করছিলাম হয়তো কোনো উষ্ণ জায়গায় ছুটি কাটাতে যাওয়ার ঘোষণা দেবেন, কিন্তু তার মুখের ভাব দেখেই বুঝেছিলাম খবরটা ভালো কিছু হবে না।

তিনি আমাদের জানালেন, আমাদের মায়ের ক্যান্সার হয়েছে।

ক্যান্সারটা ছিল তার জরায়ুর মুখে আর আকারে একটা শিশুর নখের সমান। যদিও আমি তখন ক্যান্সার সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতাম না, কিন্তু ডাক্তাররা যে এটা শুরুতেই ধরতে পেরেছেন এবং সার্জারি ও রেডিয়েশনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছেন, এটা শুনে আমার মনে আশা জেগেছিল।

এরপর বাবা আমাদের বললেন, তার পক্ষে একই সাথে ব্যবসা চালানো, বাবা এবং মায়ের ভূমিকা পালন করাটা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি আলবার্টা থেকে আমাদের আন্টি কিমকে কয়েক মাসের জন্য নিয়ে আসছেন, মায়ের সেরে ওঠার সময়টায় পারিবারিক কাজে সাহায্য করার জন্য। আমি আর আমার বোন দুজনই আমাদের পশ্চিমা আন্টি কিম আর আঙ্কেল ববকে খুব পছন্দ করতাম, তাই আমাদের মনে হলো আমরা যেন লটারি জিতে গেছি।

সার্জারি এবং রেডিয়েশন ট্রিটমেন্টের পর ডাক্তাররা আমাদের নিশ্চিত করলেন যে, তারা 'সবকিছু ঠিক করে দিয়েছেন' এবং আমার মা এখন ক্যান্সারমুক্ত। বাবা নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন যে, ক্যান্সার আর ফিরে আসবে না। তাই তিনি মাকে তার পরিচিত সেরা ন্যাচারোপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। তিনি মাকে বেশ কিছু ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট খেতে দেন। বাবা নিজেও কিছু গবেষণা করেছিলেন, যার ফলে তিনি এসিয়াক (Essiac) নামে একটি ভেষজ চা-এর খোঁজ পান। এটি চারটি ভেষজের একটি বিখ্যাত মিশ্রণ, যা অন্টারিওর ব্রেসব্রিজের নার্স রেনি কেইস ১৯৭৮ সালে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রায় ৫০ বছর ধরে ক্যান্সার রোগীদের সারিয়ে তোলার জন্য ব্যবহার করতেন। বাবা সেই ভেষজগুলো অর্ডার করেন এবং সাবধানে নির্দেশাবলী অনুসরণ করে চা তৈরি করে মাকে বেশ কয়েকবার দিয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত, আমার মায়ের সার্জারি এবং রেডিয়েশন থেরাপির পর হাসপাতালে বাজেট কমানোর কারণে তার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানার জন্য আর কোনো পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। আট মাস পর, যখন আমরা অবশেষে ডাক্তারদের দিয়ে কিছু ফলো-আপ পরীক্ষা করাতে পারলাম, তখন তারা তার কোমরের কাছে একটি মারাত্মক ধরনের ক্যান্সার দেখতে পেলেন। ডাক্তাররা কেমোথেরাপি এবং আরও রেডিয়েশনের পরামর্শ দিলেন। ভয় পেয়ে এবং আর কোনো উপায় না দেখে, আমরা তাকে আবারও চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলাম।

কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপি চিকিৎসার পর তার স্বাস্থ্যের যে মারাত্মক অবনতি হয়েছিল, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। আমার মনে আছে, ১১ বছর বয়সে আমি গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে থাকতাম আর নিচের বসার ঘরে তার পায়চারির শব্দ শুনতাম। তিনি না কাঁদার চেষ্টা করতেন, যাতে আমরা শান্তিতে ঘুমাতে পারি। আমার মনে হয়, তিনি তখন জানতেন না যে, আমি তার প্রতিটি ফোঁপানি, প্রতিটি আর্তনাদ আর সৃষ্টিকর্তার কাছে তার কষ্ট শেষ করার জন্য করা প্রতিটি আকুতি শুনতে পেতাম।

আমার মায়ের কেন এত কষ্ট হচ্ছিল?

আমি ভেবেছিলাম, আমাদের দেশের সেরা ডাক্তাররা তাকে সারিয়ে তোলার জন্য সেরা চিকিৎসা দিচ্ছেন, কিন্তু ডাক্তাররা যা কিছুই করছিলেন, তাতে সবকিছু আরও খারাপ হচ্ছিল। আমার খুব রাগ হচ্ছিল আর আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

কয়েকটা দীর্ঘ এবং কঠিন মাস পর, একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি বসার ঘরে এমন একটা দৃশ্য দেখলাম, যা আমি কোনোদিন ভুলব না। গাল বেয়ে পড়া কান্না নিয়ে আমার বাবা আমাকে আর আমার বোনকে আন্টি কিমের পাশে সোফায় বসালেন এবং জানালেন আমাদের মা আর নেই। আমি হতবাক আর দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে আছে, আমি দম বন্ধ করে রেখেছিলাম। যাতে আমার ভেতরে জমে থাকা তীব্র কষ্টটা অনুভব করতে না হয়।

বাবা সেইদিন সকালের হাসপাতালের দৃশ্যের কথা বলছিলেন, ঠিক আমাদের মা মারা যাওয়ার আগের মুহূর্তের কথা। তার মা-বাবা, তার পাঁচ ভাই-বোন এবং আমাদের স্থানীয় চার্চের একজন পাদ্রী মিলে তার হাসপাতালের বিছানার চারপাশে একটা বৃত্ত তৈরি করে প্রার্থনা করছিলেন। আন্টি কিম আমাদের বলেছিলেন, সেই শেষ মুহূর্তে ঘরের মধ্যে তিনি যে উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন, তা তার জীবনের অন্য কোনো অভিজ্ঞতার মতো ছিল না। বাবাও তাতে সায় দিয়েছিলেন। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আমার মা শেষ যে কাজটি করেছিলেন, তার শেষ নিঃশ্বাস ফেলার ঠিক কয়েক সেকেন্ড আগে, তিনি তার দুই হাত সোজা ওপরের স্বর্গের দিকে তুলেছিলেন, সৃষ্টিকর্তার কাছে আশ্রয় পাওয়ার জন্য।

মাকে হারানোটা ছিল আমার সবচেয়ে বড় ভক্তকে হারানোর মতো। আমার বেড়ে ওঠার পথে এটা ছিল সবচেয়ে বড় ধাক্কা, আর তা এমন এক খারাপ সময়ে এসেছিল, যখন আমি হাই স্কুলে পা রাখতে যাচ্ছিলাম। এর চেয়েও খারাপ ব্যাপার হলো, যখনই আমি মানুষের আশেপাশে থাকতাম, আমার মনে হতো আমার অনুভূতিগুলো লুকিয়ে রাখতে হবে। আমার এমন ভান করতে হতো যেন আমি ঠিক আছি। আমার মনে হতো, কেউ যদি কখনো

আমার ভেতরের আসল অনুভূতিটা বুঝতে পারে, তাহলে তারা আমার আশেপাশে থাকতে চাইবে না। কারণ এটা তাদের জন্য খুব অস্বস্তিকর হবে।

আমার পরিবার আর আমি কাউন্সেলিংয়ের চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমি জানতাম থেরাপিস্ট সেখানে শুধু টাকা পাচ্ছেন বলেই আছেন। তাই এতে আমার রাগ আরও বেড়ে গিয়েছিল। আমার মাকে দরকার ছিল, কোনো নকল মানুষকে নয়, যে শুধু খেয়াল রাখার অভিনয় করছে। আমার ভেতরে জমে থাকা অনুভূতির কোনো যাওয়ার জায়গা ছিল না, তাই সেগুলো ভেতরেই থেকে গেল। আমি গ্রেড এইটের গ্র্যাজুয়েশনে অধ্যবসায় এবং সংকল্পের জন্য একটি পুরস্কার পেয়েছিলাম এবং হাই স্কুলে চলে গিয়েছিলাম।

হাই স্কুলে আমি আমার বেশিরভাগ সময় ওয়েটিং রুমে কাটাতাম। প্রত্যেক লাঞ্চে, প্রত্যেক বিরতিতে, আর মাঝে মাঝে আমি ক্লাস বাদ দিয়েও ওয়ার্কআউট করতাম। আমি জায়গাটা খুব ভালোবাসতাম! আমার মনে হয়েছিল, আমি আবার একদল বন্ধু পেয়েছি যাদের আমি বিশ্বাস করতে পারি। এমন বন্ধু, যাদের ফিটনেসের প্রতি একই রকম আগ্রহ ছিল এবং যারা আরও ভালো কিছু হওয়ার জন্য চেষ্টা করছিল। স্ট্রেন্থ ট্রেনিং আমাকে নিজেকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ করার এবং নিজের সীমাবদ্ধতা ভাঙার সুযোগ করে দিয়েছিল। জিমে গিয়েই আমি প্রথম আবিষ্কার করি, যদিও আমার চেয়ে শক্তিশালী অনেক ছেলে ছিল, কিন্তু কাজের দিক থেকে আমাকে কেউ হারাতে পারত না। আমার মনে আছে, গ্রেড ইলেভেনে যখন আমার ওজন মাত্র ১৬০ পাউন্ড ছিল, তখন আমার শোল্ডার প্রেসের রেকর্ড ছিল প্রতিটি হাতে ১১০ পাউন্ড করে ৮ বার।

কিন্তু আমি যে মাসল বা শক্তি অর্জন করেছিলাম, তার চেয়েও বড় ব্যাপার হলো, ওয়েটিং রুমই ছিল প্রথম এমন জায়গা, যেখানে আমার রাগ প্রকাশ করাটা নিরাপদ এবং উপকারী ছিল। অবশেষে আমি আমার ভেতরে জমে থাকা অনুভূতির পাহাড়কে একটা কাজের জিনিসে রূপান্তরিত করার উপায় খুঁজে পেয়েছিলাম। এমন কিছু, যা আমার উপকারে আসবে এবং অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে।

হাই স্কুল শেষ করার পর আমি কলেজে যাই এবং ফায়ার সায়েন্সে ডিপ্লোমা অর্জন করি। এই সময়ে আমি কয়েকটি জিনিস শিখেছিলাম। প্রথমত, ফায়ারফাইটার হিসেবে কাজ করার জন্য যা যা দরকার, তার খুব সামান্যই কোর্সে শেখানো হয়েছিল। একটা ১০০% কংক্রিটের বিল্ডিংয়ে ফায়ার গিয়ার পরে ঢুকে একটা স্টিলের বাক্সে রাখা কাঠের আগুনে পানি ছিটানোটা কোনোভাবেই আগুনের আসল দৃশ্যের বাস্তবতা তুলে ধরে না। দ্বিতীয়ত, ফায়ারফাইটার কমব্যাট চ্যালেঞ্জের ট্রায়ালের সময় পিঠে হোসপাইপ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার ক্ষেত্রে আমার সময় সবচেয়ে কম লাগলেও, আমি শিখেছিলাম যে, ফায়ারফাইটিং একটা রাজনৈতিক খেলা। আর যেহেতু আমি খেলাধুলা করি না, তাই দলের জায়গাটা আমার চেয়ে ধীরগতির একজন পেয়েছিল। শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কলেজের সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষাগুলো ক্লাসের বাইরেই পাওয়া যায়। আমার ফাইনাল ইয়ারে, আমার একজন রুমমেট আমাকে একটি ডকুমেন্টারি দেখায়, যা আমার পুরো বাস্তবতা এবং আমার চারপাশের দুনিয়া নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করে। আমি নিশ্চিত ছিলাম না তথ্যগুলো সত্যি কি না, কিন্তু আমি জানতাম আমাকে খুঁজে বের করতে হবে।

ছোটবেলা থেকেই আমি সেলফ-হেল্প এবং নিউট্রিশনের বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। আমি বিভিন্ন থিওরি সম্পর্কে পড়তে ভালোবাসতাম এবং তারপর সেগুলো নিজের উপর পরীক্ষা করে দেখতে পারতাম কোনটা কাজ করে আর কোনটা করে না। ক্রমাগত উন্নতিই ছিল আমার পথ, যা আমি শুরু থেকেই অনুসরণ করছিলাম। আমার কখনো কোনো সন্দেহ ছিল না যে, আমি পৃথিবী বদলে দিতে পারি বা জীবনে যা চাই তা অর্জন করতে পারি।

ইন্টারনেটের যুগ পুরোদমে শুরু হওয়ার সাথে সাথে, আমি হঠাৎ নিজেকে সত্যের সন্ধানে আবিষ্কার করলাম। আমি আমার জ্ঞানকে প্রসারিত করছিলাম এবং প্রতিদিন ৮, ১০, বা ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বই, আর্টিকেল এবং ডকুমেন্টারিতে যত ধরনের গবেষণা খুঁজে পেতাম, তার সবকিছু

খুঁটিয়ে দেখছিলাম। আমি এই নতুন জ্ঞানকে আমার নিজের আর্টিকেল এবং ডকুমেন্টারিতে যুক্ত করার জন্যও অনেক সময় ব্যয় করতাম। তারপর আমার ওয়েবসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আগ্রহী যে কারো সাথে আমার কাজ শেয়ার করতাম। আমার সত্যের অনুসন্ধান শুরু হওয়ার প্রায় ১০ বছর পর, ব্যাপারটা আমার মাথায় এলো।

আমি বুঝতে পারলাম, আমার মায়ের মৃত্যুটা কোনো দুর্ঘটনা ছিল না, এটা ছিল একটা সুযোগ। তিনি আমাকে এমন একটা গল্প বলার সুযোগ দিয়েছিলেন, যা মানুষের মনকে নাড়া দিতে পারে, আর এমন একটা মন দিয়েছিলেন, যা দিয়ে সেই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা সম্ভব, যেগুলো জানার জন্য সারা পৃথিবী মুখিয়ে আছে। আমি বুঝলাম, আমার মা মারা গিয়েছিলেন, যাতে আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য তৈরি হয়।

এই উপহারের বিনিময়ে আমি মনে মনে তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আমি ক্যান্সারের কারণ এবং প্রতিকার খুঁজে বের করব, যাতে আমার এবং আমার বোনের মতো কষ্ট আর কোনো শিশুকে কখনো পেতে না হয়। আমি জানতাম, যখন আমি উত্তরগুলো খুঁজে বের করে সবার সাথে শেয়ার করতে পারব, তখন আমার মায়ের পরিচয় আর ক্যান্সারের শিকার হিসেবে থাকবে না। তিনি এমন একজন বীরে পরিণত হবেন, যিনি তার ছেলেকে মানুষের জীবন বাঁচাতে এবং পৃথিবী বদলে দিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

◈ ◈ ◈

◈ ◈ ◈

প্রারম্ভিকা

ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর প্রায় ৫০ বছর হয়ে গেল, কিন্তু আজ আগের চেয়ে অনেক বেশি মানুষের ক্যান্সার ধরা পড়ছে আর এই রোগে মারাও যাচ্ছে।[১]

আমার এটা বিশ্বাসই হতে চায় না যে, ১৯৭০ সাল থেকে ক্যান্সার গবেষণায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার খরচ করার পরও, ক্যান্সার প্রতিষ্ঠানগুলো এই রোগ প্রতিরোধ বা নিরাময়ের জন্য কার্যকরী বলতে গেলে কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি।[২] যদি এটাই সত্যি হয়, তাহলে তারা চরম অপদার্থ এবং তাদের এই অবাক করা ব্যর্থতা নিঃসন্দেহে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। কিন্তু যদি নিরাময়ের উপায় বা কার্যকরী চিকিৎসা পরিকল্পিতভাবে মানুষের কাছ থেকে আড়াল করে রাখা হয়, তাহলে তাদের এই কাজ পুরোপুরি অপরাধমূলক। আর সেক্ষেত্রে ৫৩০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের রক্তের দাগ তাদের হাতে লেগে থাকতে পারে।[৩]

ব্যাপারটা যা-ই হোক না কেন, আমি এটা পরিষ্কার করে দেব।

ক্যান্সারকে শেষ করার এই দীর্ঘ যাত্রায় মানবজাতি এখন পর্যন্ত যে মূল ভুলটা করে এসেছে, তা হলো—আমরা নিরাময়ের জন্য সেই সব লোকের ওপরই ভরসা করে বসে আছি, যারা ক্যান্সারের চিকিৎসা করে কেবলই পয়সা কামানোর জন্য। আমি এমন কারও সাথে কথা বলিনি, যে এই সহজ বিষয়টা বোঝে না : রোগ সারিয়ে দিলে তো আর টাকা আসবে না। যে ইন্ডাস্ট্রি বছরে ১২৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি আয়[৪] করে, তারা কেন নিজেদের ব্যবসাই বন্ধ করে দেবে? তারা কখনোই তা করবে না।

তাহলে আমরা উত্তরের জন্য কার দিকে তাকাব?

১৯৪৭ সালে আমেরিকার তরুণ পদার্থবিজ্ঞানী আর্নেস্ট স্টার্নগ্লাস, আলবার্ট আইনস্টাইনকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি এক্স-রে ফ্লুরোস্কোপির সময় রেডিয়েশনের মাত্রা কমানোর জন্য তার করা কাজের কথা জানান। অবাক করা ব্যাপার হলো, আইনস্টাইন তার কাজে দারুণ আগ্রহ দেখান এবং ২৩ বছর বয়সী সেই তরুণকে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেখানে তারা টানা পাঁচ ঘণ্টা কথা বলেন। স্টার্নগ্লাস স্মৃতিচারণ করেন, 'আর সেই ঘটনাটা আমার জীবনে এক বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। কারণ অন্যান্য অনেক কিছুর সাথে, তিনি আমাকে আমার থিওরি নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আমি আমার সব কাজ প্রকাশ করতে পেরেছিলাম'।[৫]

কথোপকথনের শেষে, আইনস্টাইন তাকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা দেন : 'তুমি আর অ্যাকাডেমিয়ার জগতে ফিরে যেও না, ওরা তোমার ভেতরের সব মৌলিক চিন্তা মেরে ফেলবে। একজন পূর্ণাঙ্গ প্রফেসর হতে হলে তোমাকে প্রতিটি ধাপে অনুমোদন পেতে হবে এবং তুমি প্রচলিত ধারণাকে খুব বেশি প্রশ্ন করতে পারবে না, করলে তোমার পদোন্নতি হবে না, সারাজীবন দরকার হলে একজন জুতা মেরামতকারীর মতো সাধারণ কাজ করো, যাতে তুমি মানবতার জন্য দরকারি কিছু করতে পারো'।

আমার এই বই লেখার উদ্দেশ্য হলো, এই সম্ভাবনাটা খতিয়ে দেখা যে, সাইবারস্পেসের বিশাল জগতে ভেসে বেড়ানো বিপুল পরিমাণ তথ্যের মধ্যে ক্যান্সারের নিরাময় এর মধ্যেই আবিষ্কার হয়ে গেছে। আর যেখানে একজন ডাক্তার এমন কাজ করলে তার লাইসেন্স বা চাকরি হারানোর ভয় করতে পারেন, সেখানে আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ, যার কোনো ডাক্তারি জ্ঞান নেই, সে প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ভয়ে একটা বিতর্কিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে। এই নির্মল ও বাধাহীন কৌতূহল, শৃঙ্খলা এবং জটিল তথ্যকে সহজভাবে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য— সব মিলিয়ে এমন একটি পরিশীলিত লেখা তৈরি করবে, যা বিজ্ঞানের একেবারে অগ্রবর্তী পর্যায়ের হলেও যাদের জন্য প্রয়োজন, তারা সহজেই তা বুঝতে পারবে।